4.1. সমাজ

Society

4.1.1. ভূমিকা (Introduction) :

মানুষ যখন নিবিড় পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে কোনো একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে বসবাস করে তখন তাকে আমরা সমাজ বলে থাকি। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। একত্রিত ভাবে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করাই মানুষের ধর্ম। সমাজেই মানুষ জন্মগ্রহণ করে আবার মানুষই সমাজ সৃষ্টি করে। জন্মগত ভাবে সমাজ মানুষ সৃষ্টি করে না, মানুষ নিজ প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজের সৃষ্টি করে এবং সামাজিক অনুশাসন তৈরি করে। কাজেই সমাজ আলোচনার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে মানুষ এবং তার ভূমিকা।

সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষ কেবলমাত্র একত্রে বসবাস করে না, তাদের মধ্যে চলতে থাকে অবিরাম আন্তঃক্রিয়া (interaction)। তাই ম্যাক আইভার (R.M.MacIver, 1959) বলেছেন, সমাজ হল "Web of social relationship" বা পারস্পরিক সামাজিক সম্বন্ধযুক্ত জাল। আদিম কাল থেকেই মানুষ নিজস্ব তাগিদে দলবদ্ধ ভাবে বসবাস করে। সমাজবদ্ধতার মূল ভিত্তি হল এই দলবদ্ধতা, ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন রকম কাজকর্মের স্বার্থে এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির প্রয়োজনে মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। পারস্পরিক এই নির্ভরশীলতার প্রয়োজন থেকে সমাজবদ্ধ জীবনের সৃষ্টি হয়। সাদৃশ্য ও সমতার ভিত্তিতে গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং বৈসাদৃশ্য বা বিভিন্নতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পারস্পরিক স্বেচ্ছাসম্পর্কের মাধ্যমে মানুষ সমাজের বুনিয়াদ গড়ে তোলে। এভাবে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিচিত্র ও জটিল সামাজিক সম্পর্ককেই সাধারণভাবে বলা হয় সমাজ **(Society)**।

4.1.2. সমাজের সংজ্ঞা (Definitions) :

"সমাজ" এই বাংলা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল "Society" যা লাতিন শব্দ "*Socius*" থেকে সৃষ্টি হয়েছে। "*Socius*" শব্দের অর্থ হল সাহচর্য বা সঙ্গপ্রিয়তা। **জর্জ সিমেল**-এর (George Simmal) মতে, সমাজের সঠিক নির্যাস এই সঙ্গপ্রিয়তার মধ্যে নিহিত রয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে। যেমন—

1. সামাজিকতা বা সমাজ হল একটি মানসিক বিষয়। **—জিসবার্ট (P. Gisbert, 1973)**

2. "A society is the largest group to which any individual belongs."
—গ্রীন (A.W. Green, 1972)

3. সমাজ হল বিভিন্ন প্রথা ও পদ্ধতি, কর্তৃত্ব ও পারস্পরিক সাহায্য, গোষ্ঠী ও শ্রেণিসমূহ এবং মানুষের আচরণ ও স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের একটি ব্যবস্থা বিশেষ।
—ম্যাকাইভার এবং পেজ (MacIver & Page, 1967)

4. নিজেদের ঐক্য সম্পর্কে সচেতন সমমনোভাবাপন্ন কিছু সংখ্যক ব্যক্তি অভিন্ন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে একযোগে চেষ্টা করলে সমাজ সৃষ্টি হয়।

—গিডিংস ("The Elements of Sociology" গ্রন্থে F.H. Giddings , 1913)

5. মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, সংগঠিত বা অসংগঠিত, সচেতন বা অচেতন, সহযোগিতামূলক বা বৈরিতামূলক সমস্ত সম্পর্কই হল সমাজ।

("The term society may be used to include all or any dealings of man with man, whether these be direct or indirect, organised or unorganised, conscious or unconscious, cooperative or antagonistic.")

—"Sociology" গ্রন্থে মরিস জিনসবার্গ (Morris Ginsberg, 1950)

6. সমাজের সদস্য ব্যক্তিবর্গের সম্পর্কই হল সমাজ। **—টিমাসেফ (N.S. Timasheff, 1967)**

7. "Society is a complex forms or processes each of which is living and growing by interaction with each others, the whole being so unified that what takes place in one part affects all the rest." **—কুলি (C.H. Cooley,1913)**

8. একটি সম্প্রদায়ের মধ্যস্থিত প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠিত সংগঠনের সমাহার হল সমাজ।

—কোল (D.M. Cole, 1958)

9. "The term society refers not to group of people, but to the complex pattern of norms of interaction, that arise among and between them." **—লা-পিয়ের (La-piere, 1965)**

10. কিছু সংখ্যক ব্যক্তি একে অপরের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বসবাস করলে সমাজ গঠিত হয়। **–R.N. Gilchrist (আর. এন. গিলক্রাইস্ট)**

সুতরাং সমাজ বলতে এমন এক জনসমষ্টিকে বোঝায় যারা একটি সাধারণ ঐতিহ্য, প্রথা, জীবন প্রণালী ও সাধারণ সংস্কৃতি দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে একত্রে বসবাস করে। গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করার জন্য সমাজ সচেতনতা, সম্প্রীতি এবং সহযোগিতার মনোভাব জন্মলাভ করে। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষ শুধু সমাজে একত্রে বাস করে না, তাদের মধ্যে অনবরত আন্তঃক্রিয়া চলতে থাকে যে আন্তঃক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে সমাজেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য হয়।

4.1.3. সমাজের উৎপত্তি (Origin of Society) :

মানব ইতিহাসে সমাজের উদ্ভব হঠাৎ কোনো ঘটনা নয়। প্রয়োজন পূরণের তাগিদে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সমাজ গড়ে উঠেছে। মানুষের সচেতন ও সক্রিয় উদ্যোগ হল সমাজ। প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজের উৎপত্তির ইতিহাস মানবজাতির উদ্ভবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আদিমযুগে মানুষ মূলত খাদ্য, নিরাপত্তা, প্রতিকূলতার মোকাবিলা করা ইত্যাদির জন্য একসঙ্গে বসবাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ফলে সৃষ্ট সম্পর্কের বন্ধনের ওপর ভিত্তি করে সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। কালক্রমে কয়েকটি বিশেষ বিষয়, যেমন— আত্মীয়তা, বিবাহ, পরিবার, সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি মানুষের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া, পারস্পরিক সম্পর্ক, সহযোগিতা প্রভৃতি সমাজবদ্ধতার নানা উপাদান ও মানসিকতার সৃষ্টি করেছে। পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং নির্ভরশীলতার ভিত্তিতেই মানুষের জীবনধারা পরিচালিত হয় এবং পরবর্তীকালে এই জীবনধারা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে।

4.1.4. সমাজ সৃষ্টির বিভিন্ন মতবাদ (Different Concepts of Origin of Society) :

মানবসমাজের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। যেমন—

(1) জৈবিক মতবাদ (Organic Theory) : প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে এই মতবাদের প্রমাণ পাওয়া

যায়। বেদে যে চতুর্বর্ণের কথা উল্লেখ রয়েছে সেখানে ব্রাহ্মণ হল মস্তক স্বরূপ, ক্ষত্রিয় বাহু স্বরূপ, বৈশ্য দেহের মধ্যভাগ এবং শূদ্রকে পদযুগলের সঙ্গে কল্পনা করা হয়েছে। জৈবিক মতবাদ অনুযায়ী সমাজদেহের অঙ্গসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভূমিকাগত পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই মতবাদে সমাজের সামগ্রিক প্রকৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

গ্রিক দার্শনিক **প্লেটো** (Plato) মানবাত্মা, প্রজ্ঞা ও সাহসের প্রতীক হিসেবে শাসক, যোদ্ধা ও কারিগরদের কথা বলেছেন। **অ্যারিস্টট্‌ল** (Aristotle) রাষ্ট্র ও মানবদেহের মধ্যে তুলনামূলক ও সাদৃশ্যমূলক আলোচনা করেছেন। **স্পেনসার** (Spencer) সমাজের উৎপত্তি ব্যাখ্যা হিসেবে এই মতবাদকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন। তিনি জীবদেহ ও মানবসমাজের মধ্যে সাদৃশ্যমূলক আলোচনাকে অনেক বেশি এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

বর্তমানে এই মতবাদকে আর প্রাসঙ্গিক বলে অনেকে মনে করেন না।

(2) ঐশ্বরিক মতবাদ (Theory of Divine Origin) : অত্যন্ত প্রাচীন এই মতবাদ অনুযায়ী সমাজ হল ঈশ্বরের সৃষ্টি। বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাই সমাজও তাঁর সৃষ্টি। পরে অবশ্য আধুনিক চিন্তাভাবনার প্রসারের ফলে এই মতবাদ অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হয়।

(3) শক্তি-প্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force) : এই মতবাদ অনুযায়ী শক্তি প্রয়োগের ফলেই সমাজ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন কালে বলবান ব্যক্তি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যান্যদের ওপর আধিপত্য কায়েম করত এবং ওই শক্তিমান ব্যক্তির অধীনে সবাই থাকতে বাধ্য হত। সে তার ইচ্ছা অনুযায়ী নিজস্ব প্রয়োজনে সমাজ তৈরি করত এবং সমাজের নিয়মকানুন, প্রথা, আচরণ পদ্ধতি ঠিক করত। সমাজস্থ সকল ব্যক্তি সেইসব নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য হত। কালক্রমে সমাজের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসেবে এই মতবাদ তার গ্রহণযোগ্যতা হারায়।

(4) পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal and Matriarchal Theory) : সমাজ গড়ে উঠেছে পরিবার সম্প্রসারণের ফলে। এই সমাজ কোথাও পিতৃতান্ত্রিক, কোথাও বা মাতৃতান্ত্রিক। কিন্তু শুধুমাত্র পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে সমাজ গড়ে ওঠে না। এটি একটি জটিল সামাজিক প্রক্রিয়ার ফসল। প্রতিটি ব্যক্তির পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তার তাগিদে গড়ে ওঠে সমাজ নামক বৃহৎ মানবীয় সংগঠন।

(5) সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Theory of Social Contract) : এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষের সক্রিয় চেষ্টার ফলে গড়ে উঠেছে সমাজ। মানুষ তার জীবনযাপন প্রণালী সহজ ভাবে চালনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন পূরণের তাগিদে সুপরিকল্পিত ভাবে সমাজের সৃষ্টি করেছে। সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট চুক্তির মাধ্যমে তৈরি হয়েছে সমাজ। **হবস্** (Thomas Hobbes), **লক** (Locke) এবং **রুশো** (Rousseau) এই মতবাদের তিন প্রধান প্রবক্তা। দুর্বিষহ ও ভয়াবহ প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বাঁচার জন্য মানুষ উদ্যোগী হয়ে চুক্তির মাধ্যমে তৈরি করল সমাজ।

অনেক অবশ্য সমাজকে চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট একটি কৃত্রিম ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিপন্ন করা যায় না বলে মত প্রকাশ করেছেন।

(6) বিবর্তন মতবাদ : (Evolutionary Theory) : প্রকৃতপক্ষে সমাজের উদ্ভব কোনো একটি বিশেষ কারণে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। এর সৃষ্টি হয়েছে, ক্রমবিবর্তনের পথ ধরে। এই মতবাদ অনুযায়ী সমাজ সৃষ্টি করা হয়নি। তার উৎপত্তি হয়েছে ক্রমবিবর্তনের ধারায়। এই বিবর্তন ঘটেছে বিরতিবিহীন ভাবে। **বিদ্যাভূষণ ও সচদেব-এর** মতে, *"Society is not a make but a growth. It is the result of a gradual evolution. It is a continuous development from organised to unorganised, from less perfect to more perfect. Various factors helped in its development from time*

to time." বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপাদান, যেমন—আত্মীয়তা, বন্ধন, পরিবার, ধর্ম ইত্যাদি এই বিবর্তনের ক্ষেত্রে কার্যকারী ভূমিকা পালন করেছে।

4.1.5. সমাজের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Society) :

সমাজের নিজস্ব কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাকে অন্যান্য সংগঠন থেকে পৃথক করে রাখে। এগুলি হল—

(1) প্রাচীনতম সংস্থা : (The oldest organisation) : প্রকৃতপক্ষে সমাজই হল পৃথিবীর প্রাচীনতম মানব সংগঠন। সমাজ অন্যান্য সংস্থাসমূহের পূর্ববর্তী তো বটেই, তা ছাড়াও তাদের সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিকও বটে। মূলত এই বিশ্বসংসার এবং সমাজ হল সমকালীন। তাই এটি প্রাচীনতম সংস্থা হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

(2) বিমূর্ত প্রকৃতি (Abstract) : বাস্তবে সমাজের কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্ব নেই। সমাজ একটি বিমূর্ত ধারণা বিশেষ। সমাজ প্রকৃত অর্থে সামাজিক সম্পর্ককে বোঝায় যা অবশ্যই বিমূর্ত। এটি একটি অনুভূতি।

(3) সমাজ সর্বব্যাপক (Society – All parvasive) : পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জীবজগতের মধ্যে, প্রতিটি প্রজাতির মধ্যে সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব রয়েছে। তবে অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় মানবসমাজের বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। কারণ পারস্পরিক সচেতনতা ও মিথস্ক্রিয়া এই সমাজেই পরিলক্ষিত হয়।

(4) জনসমষ্টি (Population) : সমাজ গঠনের জন্য জনসংখ্যা প্রয়োজন। তবে সমাজ গঠনের জন্য কতজন আবশ্যক তার কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। বিশাল অ-গঠিত জনসমাজ যেমন সমাজ হতে পারে না, আবার কয়েকটি ব্যক্তিও সুগঠনের মাধ্যমে একটি সমাজ গড়ে তুলতে পারে। কারণ সমাজ সৃষ্টির মূল কথা হল একটি জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশা এবং এই মেলামেশার মাধ্যমে গড়ে ওঠা সামাজিক সম্পর্ক।

(5) সামাজিক উদ্দেশ্য (Social objectives) : বিশেষ কোনো সামাজিক উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সমাজ গঠিত হতে পারে। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে কখনোই কোনো সমাজ গড়ে ওঠে না।

(6) পারস্পরিক সচেতনতা (Reciprocal awareness) : সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সচেতনতা হল সমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ["Society rests on consciousness of the kind." (Giddings, 1904)]। সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য একে অপরের উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত থাকা দরকার। এই পারস্পরিক সচেতনতাই একটি নির্দিষ্ট সমাজ গড়ে তোলার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে থাকে।

(7) বিশ্বজনীনতা (Universality) : সমাজ হল সর্বজনীন। কোনো মানবিক সংস্থা বা সংগঠন সমাজের মতো বিশ্বজনীনতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। সমাজের বাইরে যে বাস করে হয় সে পশু, না হয় দেবতা। মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারণের স্বার্থে, মানবসভ্যতার স্বার্থে সমাজের অস্তিত্ব অপরিহার্য এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক। সমাজের সদস্যপদ মানুষের কাছে বাধ্যতামূলক ["A Society is universal and pervasive and has no definite boundary or assignable limits" (Ginsberg, 1905).]।

(8) অভিন্নতা (Likeness) : সমাজ সৃষ্টিতে অভিন্নতা অপরিহার্য, অভিন্নতা হল সাদৃশ্য। প্রয়োজন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মতাদর্শ, মূল্যবোধ, জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, কার্যপ্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে জনসমষ্টির মধ্যে যদি সাদৃশ্য থাকে তবেই সবার বসবাসযোগ্য সমাজ তৈরি হতে পারবে। কারণ এর ভিত্তিতে ঐক্যবোধের সৃষ্টি হয়। এই ঐক্যবোধ সহযোগিতার জন্ম দেয় যা সমাজের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে।

(9) বিভিন্নতা (Unlikeness) : সাদৃশ্য বা অভিন্নতার মতো বৈসাদৃশ্যও সমাজের মধ্যে বর্তমান। সামর্থ, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, মানসিকতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বহু ক্ষেত্রে মানুষে-মানুষে পার্থক্য বর্তমান। যোগ্যতা বা গুণগত বিচারের পার্থক্যের কারণে সমাজে কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, লেখক প্রভৃতি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের দেখা যায়। এই বিভিন্নতার কারণেই সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক বন্ধন এতই সুদৃঢ় ও পারস্পরিক নির্ভরশীল হয় যা প্রকৃতপক্ষে একটি সুদৃঢ় ও কাম্য সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

(10) স্থায়িত্ব (Stablity) : সমাজ অবশ্যই স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। ক্ষণস্থায়ী সমাজ গড়ে উঠতে পারে কিন্তু তা আদর্শ সমাজের লক্ষ্য নয়। সমাজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য সমাজের স্থায়িত্ব প্রয়োজন।

(11) গতিশীলতা (Dynamicity) : সমাজ পরিবর্তনশীল। নতুন নতুন সংস্থা, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী সমাজের মধ্যে তৈরি হয় এবং পুরানো অপসারিত হয়। সমাজের মধ্যে পরিবর্তন কালের নিয়মে সংঘটিত হয় যা আবার নতুন সমাজের জন্ম দেয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের চাহিদা, প্রয়োজন, উদ্দেশ্যরও পরিবর্তন হয় এবং এই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নতুন সমাজ ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে।

(12) মূল্যবোধ (Values) : সমাজস্থ সদস্যদের মধ্যে মূল্যবোধ থাকা বিশেষ ভাবে দরকার। সামাজিক মূল্যবোধই সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। সদস্যদের মধ্যে নৈতিক ও আদর্শগত মূল্যবোধ না থাকলে সামাজিক আদর্শ বিচ্যুত হবে এবং সমাজ ভেঙে পড়বে। পারস্পরিক সম্পর্ক জীবনধারাগত আদর্শ বা মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

(13) সহজাত প্রবৃত্তি (Basic instinet) : প্রকৃতপক্ষে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সমাজ গড়ে ওঠে এই জটিল সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে।

(14) শ্রমবিভাগ (Division of labour) : সমাজের মধ্যে নানা কাজ সম্পন্ন হয়। এক-একটি সামাজিক গোষ্ঠী এক-একটি কাজের দায়িত্ব পায়। শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ হল আধুনিক জটিল সমাজব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তাই সমাজে বিভিন্ন পেশা ও দক্ষতার ব্যক্তিবর্গ বর্তমান।

(15) সহযোগিতা (Co-operation) : সাধারণ বা অভিন্ন স্বার্থ সম্পর্কে সচেতনতার ভিত্তিতেই সহযোগিতার সৃষ্টি হয়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ একে অপরের জন্য অনুভব ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে তবেই না সমাজ স্থায়ী হবে, সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হবে। পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ না থাকলে সেই সমাজ বাসযোগ্য বলে গণ্য হয় না।

(16) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social control) : সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। নয়তো সমাজের গ্রন্থি আলগা হয়ে পড়বে এবং সমাজ ধ্বংস হবে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের জন্য সামাজিক নিয়মকানুন, প্রথা, আচার-বিচার নির্ধারিত হয় এবং বিশেষ ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠী, যেমন— সংবিধান, পুলিশ, আদালত প্রভৃতির হাতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজে সংঘঠিত অসামাজিক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ বা রোধ করা হয় নয়তো সমাজের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হবে।

(17) সংস্কৃতি (Culture) : স্থান ও কাল ভেদে সামাজিক সংস্কৃতি ভিন্ন প্রকৃতির হয়। মানুষের জীবনধারা, আচার-ব্যবহার, চিন্তাভাবনা প্রভৃতির প্রকাশই হল সংস্কৃতি। তাই প্রতিটি সমাজের সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বর্তমান যা একটি সমাজকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করে, যেমন— সাধারণ সমাজ থেকে উপজাতি সমাজ সাংস্কৃতিক দিক থেকে পৃথক হয়।

(18) সংগঠন (Organization) : মানুষের পারস্পরিক দৃঢ় ও স্থায়ী সম্পর্কের ফল হল বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন। মানুষ তার উদ্দেশ্য ও চাহিদা পূরণের জন্য সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সংগঠন সৃষ্টি

করে। সেখানে পরিবারের মতো ক্ষুদ্র সংগঠন থেকে সংঘ-সমিতির মতো বৃহদাকার সংগঠনও রয়েছে। সমাজের বাস্তব পরিচয় প্রকাশ পায় সংগঠনের মাধ্যমে। সমাজ পরিপুষ্ট হয় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের একত্র সমাবেশ দ্বারা।

4.1.6. সমাজের উপাদানসমূহ (Elements of Society) :

সমাজ গঠিত হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত বা প্রয়োজন আগেই পূবণ হওয়া প্রয়োজন। কারণ এই শর্তগুলিই সমাজের মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। নীচে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদানগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

(1) পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (Inter-dependence) : পারস্পরিক নির্ভরশীলতা হল সমাজ গঠনের অন্যতম মৌলিক উপাদান। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ, সংঘ, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকে একে অন্যের সাহচর্যে ও সাহায্যে পরিপূর্ণতা অর্জন করে। আজকের জটিল বিশ্বে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার এই নজির ভীষণভাবে দেখা যায়। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রটির পরিধি যেমন প্রসারিত তেমনি এর শিকড়ও অনেক গভীরে প্রোথিত। আধুনিক মানবসভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে পারস্পরিক এই নির্ভরশীলতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। বর্তমানে পারস্পরিক এই নির্ভরশীলতার ক্ষেত্র যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি এর প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়ে চলেছে।

(2) অভিন্নতা (Likeness) : অভিন্নতা হল সমাজের একটি প্রাথমিক উপাদান। "Without likeness and sense of likeness there could be no mutual recognition be 'belonging together 'and therefore no society". (MacIver & Page, 1967) এক অভিন্ন লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্যে সমাজ তৈরি হয়। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর এই অভিন্নতা নির্ভরশীল। মূল্যবোধ, ঐক্য, সহযোগিতা, মানসিকতা অভিন্ন হলেই তবে একটি সুন্দর ও সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে নয়তো নিত্যনতুন দ্বন্দ্বে ক্লিষ্ট ও জীর্ণ হয়ে অবেশেষে সমাজ ভেঙে পড়তে বাধ্য হবে।

(3) সহযোগিতা (Co-operation) : সমাজের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে সহযোগিতার গুরুত্ব অপরিসীম। পারস্পরিক সুস্থ সহযোগিতার বাতাবরণেই গড়ে ওঠে একটি সুস্থ সমাজ। পারস্পরিক মানবিক, সামাজিক সম্পর্ক যা সমাজের সৃষ্টির মূল ভিত্তি, তা গড়ে ওঠে এই সহযোগিতার ভিত্তিতেই। একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি, অনুভব বা সহযোগিতার মনোভাব না থাকলে সমাজ স্থায়িত্ব লাভ করে না।

(4) নিয়ন্ত্রণ (Control) : সমাজের স্থায়িত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে সমাজে ঘটমান অসামাজিক কার্যাবলির নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত প্রয়োজন। এই নিয়ন্ত্রণের দ্বারাই সমাজ সুসংহত ও সুগঠিত হবে।

(5) স্বাধীনতা (Liberty) : সমাজ শুধু নিয়ন্ত্রণ দ্বারা চালিত হয় না, তার জন্য স্বাধীনতাও প্রয়োজন। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য। তবে একের স্বাধীনতা যাতে অন্যের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায় না হয় তার জন্য দরকার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। ব্যক্তির আচার-আচরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতা সৃষ্টি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

(6) কর্তৃত্ব (Authority) : সমাজব্যবস্থার শান্তি-শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে সমাজে কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব অনিবার্য। কারণ ওই কর্তৃপক্ষই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজের স্থায়িত্ব রক্ষা করে।

(7) পদ্ধতি বা প্রকরণ (Procedures) : সমাজের বিভিন্ন কর্মপ্রক্রিয়া সচল রাখার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি বা প্রকরণ অবলম্বন করা হয়। এই পদ্ধতিগুলিই সমাজের সংহতি ও সংগঠন অটুট রাখে।

(8) প্রথা বা রীতিনীতি (Usages) : প্রতিটি সমাজে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, বিবাহ, খাদ্যাভ্যাস, শিক্ষা পদ্ধতি বিভিন্ন রকমের। এই সমস্ত উপাদানগুলি সমাজকে অন্য আর একটি সমাজ থেকে পৃথক করে রাখে।

(9) বিভিন্নতা (Differences) : অভিন্নতার মতো বিভিন্নতা বা বৈসাদৃশ্যও সমাজের একটি অন্যতম উপাদান। একটি সমাজে স্বভাবতই বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায়, মানসিকতার ব্যক্তি বাস করে। তাদের এই বিচিত্রতাই এক বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজের জন্ম দেয়। এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, উদ্দেশ্য, প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এক অভিন্ন সমাজ যার মধ্যে বৈচিত্র্যর মাঝে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ— ভারতবর্ষ।

(10) গোষ্ঠীচেতনা (Community feeling) : সমাজ নিছক কোনো একটি কাঠামোগত ধারণা নয়। এটি একটি চেতনার বহিঃপ্রকাশ, যে চেতনা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গড়ে ওঠে। যদি ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গোষ্ঠীচেতনা বা "আমরা" বোধ গড়ে না ওঠে তা হলে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বা সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি হয় না যা একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য।

4.1.7. সমাজের কার্যাবলি (Functions of Society) :

মানুষের সামাজিক সংগঠন হিসেবে সমাজ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে। যেমন—

(1) সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন (Establishment of social relations) : সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সুস্থ ও সুন্দর মানবিক ও সামাজিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলে সমাজ। সমাজবদ্ধ মানুষই একে অপরের সঙ্গে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

(2) যোগাযোগ স্থাপন (Creating communication) : সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পরিপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করে একে অপরের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানের পথ খুলে দেয় সমাজ। ফলে সমাজ স্থায়িত্বও লাভ করবে।

(3) সামগ্রিকতার সৃষ্টি (Formation of totality) : সামগ্রিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের সময়, শান্তি রক্ষা বা পরিপূর্ণ কাজে লাগতে পারে সমাজ। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ সামগ্রিক চেষ্টার মাধ্যমেই সংঘবদ্ধ ভাবে সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে পারে।

(4) মর্যাদার সৃষ্টি (Creation of dignity) : সমাজ মানুষের মধ্যে একটি সামাজিক মর্যাদা সৃষ্টি করে যা তাকে অন্যের থেকে পৃথক করে চিনতে সাহায্য করে। সমাজে তাদের একটি স্বীকৃত পদমর্যাদা থাকে যা তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে।

(5) সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি (Increase of members) : সমাজের একটি প্রধান কাজ হল দক্ষতার মাধ্যমে নিয়মিত এর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা। বিবাহ, আত্মীয়তা, রক্তের সম্পর্ক, ধর্মীয় সম্পর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজ তার নিজস্ব সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে।

(6) সামাজিকীকরণ (Socialization) : ব্যক্তির সামাজিকীকরণে সমাজ বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে একাত্মবোধ জাগ্রত হয়। ফলে অসামাজিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

(7) নিরাপত্তা (Safety) : সমাজ তার সদস্যদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অসামাজিক কার্যাবলি প্রতিরোধ করে সমাজে সবার নিরাপদে অবাধ বিচরণকে সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব সমাজের।

(8) সম্প্রীতি রক্ষা (Conserve fraternity) : সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করা সমাজের অন্যতম প্রধান একটি কাজ। অত্যন্ত সংগঠিত ভাবে এই কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে পড়বে।

(9) **স্বাধীনতা রক্ষা (Preserve liberty)** : সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ যাতে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য স্বাধীন একটি পরিবেশ লাভ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করা সমাজের কাজ।

(10) **বিনোদনের ব্যবস্থা করা (Recreational facilities)** : সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের জন্য আমোদ প্রমোদ ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা সমাজের কাজ। বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিজস্ব প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই বিনোদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

উপসংহার (Conclusion) :

সমাজ সৃষ্টির মূল কথা হল পারস্পরিক মেলামেশার মাধ্যমে সৃষ্ট সামাজিক সম্পর্ক। পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ এবং সচেতন মানবগোষ্ঠীই হল সমাজ। সম্পর্ক সমূহের এই বিন্যাস বা ধারাই হল সমাজ। সমাজ শুধু সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ বা কোনো প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো নয়, সমাজের যথার্থ প্রকৃতি (nature) সমাজবদ্ধ মানুষের মানসিক অবস্থার দ্বারা গঠিত হয়। এক্ষেত্রে **লাপিয়ার** (R.T. La Piere)-এর মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন, "The term society refer not to a group of people, but to the complex pattern of the norms of interaetions, that arise among and between them".